# অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমানের স্মৃতিকথা “পথে যা পেয়েছি ” গ্রন্থের ২য় খন্ডের ওপর আলোচনা সভা

স্থান : সুফিয়া কামাল মিলনায়তন,
জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ
তারিখ :১২আগষ্ট, ২০০৭
সময় : বিকাল ৫.৩০ মি.

## আয়োজনে : পাঠক আড্ডা ও অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
## সহযোগিতায় : এএলআরডি ও নিজেরা করি

গত ১২আগষ্ট ২০০৭ ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে পাঠক আড্ডা ও অ্যাডর্ন পাবলিকেশনের যৌথ উদ্যোগে এবং এএলআরডি এবং নিজেরা করির সহযোগিতায় অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমানের স্মৃতিকথা "পথে যা পেয়েছি" গ্রন্থের ২য় খন্ডের ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন ড. মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন শামসুল হুদা, সমন্বয়ক পাঠক আড্ডা এবং নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি। প্রকাশকের বক্তব্য রাখেন সৈয়দ জাকির হোসাইন, প্রকাশক ও প্রধান নির্বাহী ,অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. হামিদা হোসেন (গবেষক, নারী অধিকার ও মানবাধিকার কর্মী), ড. আহমেদ কামাল (অধ্যাপক , ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), খুশী কবির (উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী), ড. আবুল বারকাত (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি) এবং এহসানুল হাফিজ জয় (চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি)। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাজী মদিনা ।

## স্বাগত বক্তব্য :

শামসুল হুদা
সমন্বয়ক , পাঠক আড্ডা
এবং
নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

কেন আমরা এ অনুষ্ঠান আয়োজনে উদ্যোগী হলাম সে বিষয়ে কেউ কোন কৈফয়ত চাননি। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি এ অনুষ্ঠান আয়োজনের নেপথ্যের কারণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় ।

কিছুদিন পূর্বে এই বই আমি নিজে পাঠ করেছি। এই বইয়ে লেখক যেসব বিষয়ে তার মতামত প্রকাশের পাশাপাশি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেগুলি শুধুমাত্র তার ব্যাক্তিগত বিষয় নয়। এ বিষযগুলি আমাদের প্রজন্মের যারা মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও গুরুত্ববহ। আলোচ্য বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত তাদের পীড়িত ও তাড়িত করে। সে কারণে ক্ষুদ্র পরিসরে পাঠক আড্ডায় কয়েক মাস আগে আমরা বইটি নিয়ে আলোচনা করি। সেসময় এত ক্ষুদ্র পরিসরে এরকম একটি বই নিয়ে আলোচনা করলে বইটির প্রতি সুবিচার করা হয় না বলে অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন। আমরাও অনুভব করি যে, এই বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি সুবিচার করতে চাইলে আরো বৃহৎ পরিবেশে আলোচনা হওয়া উচিত। মূলতঃ সে তাগিদ থেকে এ আলোচনা সভা আয়োজনে আমরা উদ্যোগী হই। পাঠক ও পাঠক আড্ডার পক্ষ থেকে আমরা প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সাথে যোগাযোগ করি। তারা সাগ্রহে অনুমতি দেন। এজন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীমন্ডলীর মধ্যে একদিকে যেমন আছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম যাদের অনেকেই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তেমনি আছেন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আমি মনে করি এমন একটি অডিয়েন্স এ আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এরকম একটি মিলনায়তনের বেষ্টনীর মধ্যে বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলি নতুনভাবে উত্থাপন করার কাজটি সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এ আলোচনা আরো বিস্তৃত পরিসরে হওয়া উচিত।

এই বইটি পড়তে গিয়ে আমার মনে বার বার ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কথা : মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। লেখক বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন অনুষ্ঠানের শুরুতে কাজী মদিনা তার একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন। সেগুলি পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে বইটিতে লেখকের অনেক হতাশা ও আশাভংগের কথার মাঝেও কিন্তু বার বার উচ্চারিত হয়েছে আস্থার কথা। এ বইটি লেখার মধ্যে দিয়ে মানুষের ওপর আস্থা রাখার একটি মেসেজ পাঠকের সামনে রেখেছেন।

১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত দেশে যেসব বুদ্ধিজীবি-ছাত্র-কৃষক ও আপামর জনসাধারণ কিভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুন:নিমার্ণে ব্রতী হয়েছিলেন তাদের দেশপ্রেম ও ত্যাগে কোন খাদ ছিল না, আজো নেই। তারা যুদ্ধ করেছিলেন, ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন , জীবন পর্যন্ত দান করে গেছেন। সেইসব মানুষদের ওপর আস্থা রাখার কথা বইটিতে বার বার উঠে এসেছে। আমরা আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা - বিচ্যুতির কারণে হতাশায় নিমজ্জিত। কিন্তু এই ব্যর্থতা -বিচ্যুতির কারণে সাময়িক পরাজয়। তবে হতাশাই কিন্তু জীবনের শেষ কথা নয় --- এই কথাটিই বইয়ে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। সে কারণে বইটি আমাদের আকৃষ্ট করেছে।

আমরা যারা ঘটনাচক্রে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলাম তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ অন্যরকম। এই আবেগের মধ্যে আমরা বড় হয়েছি। আবেগ তাড়িত হতে গিয়ে আমরা হতাশাগ্রস্তও হয়েছি। আমাদের আশা ভংগ হয়েছে, আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। আমরা আমাদের উদ্যমও অনেকখানি নষ্ট করে ফেলেছি। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের তরুণ সম্প্রদায় উদ্যম হারানোর দুর্ঘটনা কবলিত হয়নি। তাদের যদি উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত করা যায় তবে আমরা আমাদের ভবিষ্যত ফিরে পেতে সক্ষম হবো, আমাদের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন পুনরুদ্ধার করতে পারবো -- এই বার্তা বইটিতে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। আমরা যারা আজো স্বপ্নের সেই দেশকে ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখি তাদের হয়তো এই বই বহুবার পড়তে হবে। তাই এই বই শুধু স্মৃতিকথা নয়, তার থেকেও বেশি কিছু।

আপনারা যারা আজ এ অনুষ্ঠানে এসেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সফল করার জন্য।

## প্রকাশকের বক্তব্য

সৈয়দ জাকির হোসেইন
প্রকাশক
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাংলাদেশ নামক ভূ-খন্ডের একটি সময়কে যিনি ধারণ করেছেন সেরকম একজন মানুষের তার সমকালের বিষয় নিয়ে লেখা আত্মজীবনী প্রকাশ করতে পেরে আমি প্রকাশক হিসাবে ধন্য। প্রকাশক হিসাবে কথা বলতে গেলে কথাগুলি প্রকাশনা কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। যদিও বইয়ের ভেতরে যেতে পারলে আমার খুব ভালো লাগাতো।

বাংলাদেশে বই প্রকাশ করা খুব সহজ। কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করলেই একটি বই প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দু:খজনক বিষয় হচ্ছে বই প্রকাশের পর ঐ প্রকাশককেই বইটি ফেরি করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে হয়। কখনো আমরা বইটি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারি, কখনো বা পারি না। বিভিন্ন বইয়ের দোকানে বইটি পৌঁছে দিতে আমরা চেষ্টা করি। অধ্যাপক মো: আনিসুর রহমানের এই বইটির ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট ছিলাম। সুদূর লন্ডন আমেরিকায় কোন বই প্রকাশিত হলে যেমন- ছোটদের জন্য লেখা হ্যারি পটার, আমাদের মিডিয়াগুলিতে যেরকম প্রচারের ঝড় ওঠে, অথচ কোন

গুরুত্বপূর্ণ দেশী বইয়ের প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের সেরকম আগ্রহ দেখা যায় না। বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কোন বই প্রকাশের পর তাদের কাছে প্রচারের জন্য প্রেরণ করার অভিজ্ঞতায় দেখেছি তারা এক কলাম জায়গা বা নিউজের ১ মি. সময়ও বইয়ের জন্য বরাদ্দ করে না। তাহলে কিভাবে আমরা পাঠকের কাছে বইয়ের খবর পৌছে দেব? এটি কোন অভিমান বা অভিযোগ নয়। এটি আমাদের দৈন্যদশা তুলে ধরার একটি অক্ষম প্রয়াস মাত্র। শুধুমাত্র প্রকাশক হিসাবে কথা বলতে চাইলে অন্য কথা বলতাম। কিন্তু আমি নিজেকে একটু আলোচক হিসাবে দাঁড় করাতে চাইছি বিধায় কথাগুলি বলতে হচ্ছে।

মো: আনিসুর রহমানের 'পথে যা পেয়েছি' বইটির পান্ডুলিপি ২০০৪ সালে প্রথম আমার হাতে আসে। বইটি পাঠ করে বিভিন্ন কারণে বইটির প্রতিটি শব্দে আমি আলোড়িত হই। কিন্তু এই আলোড়িত হবার বিষয়টি এভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করার সুযোগ পাইনি। পাঠক আড্ডা, এএলআরডি ও নিজেরা করি আজ তা প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়ায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নেপথ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজ গড়ে উঠতো না, আমরা পূর্ব পাকিস্তান পেতাম না, পূর্ব পাকিস্তান না পেলে আমরা ভাষা আন্দোলন করতাম না , আর ভাষা আন্দোলন না করলে আমরা আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন অব্যাহত রেখে স্বাধীনতা লাভ করতে পারতাম না। তবে সেক্ষেত্রে তখন কি হতে পারতো আমি জানি না, সমাজবিজ্ঞনী ও ইতিহাসবিদরা তা বলতে পারবেন। আমার দৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার ঘটনাটির সাথে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিশাল যোগসূত্র রয়েছে। এই বিষয়টি এই মূহূর্তের আলোচনায় অবতারণা করার বিশেষ কারণ রয়েছে। গ্রন্থকার মো: আনিসুর রহমান এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তার এই গ্রন্থে অর্থনীতি বিভাগের অনেক কথা বলেছেন।

পৃথিবীর আর কোথাও কোন বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। ব্যাতিক্রম শুধু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিকভাবে মূল্যবোধের দিক থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি তার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। তাই এসময়ে এই বইয়ের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমাদের বোধকে নাড়া দেবার জন্যও বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইয়ের মূল দর্শন হলো যেকোন সমাজকে এগিয়ে নেবার জন্য কাউকে না কাউকে আত্ম-উৎসর্গ করতে হয়। বাংলাদেশের জন্ম হবার পর এই আত্ম-উৎসর্গ করার মত মানুষ ছিল না বলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের ভূমিকাগুলি যথার্থ ছিল না। সব গন্ডগোলের সূত্রপাত কিন্তু বাংলাদেশ জন্মের পরপরই। আত্ম-উৎসর্গ করার বদলে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা তখন থেকে প্রকট হতে লাগলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের আত্ম-উৎসর্গ করার ভূমিকা থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটা শুরু হলো ।

গ্রন্থকার ব্যাক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের গুনগ্রাহী। রবীন্দ্রনাথ নোবেলের টাকা কৃষি ঋণের জন্য দান করেছিলেন, বইয়ের রয়্যালিটি দিয়ে বিশ্ব ভারতী গড়ে তুলেছিলেন। উৎসর্গ করার মধ্যে দিয়ে একটি জাতি গড়ে উঠে। আমরা নিজেদের উৎসর্গ করতে শিখিনি, আমরা উৎসর্গ করতে জানি না বা করি না। নিজেদের স্বার্থ ঠিক না রেখে আমরা কিছু করি না।

আমার মতে জীবনের দর্শন হওয়া উচিত দেশের জন্য আত্ম-উৎসর্গ করা। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে একজন মানুষের পোষ্টগ্রেজুয়েট হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের অনেক টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। তাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রেজুয়েট হয়ে বের হবার সময় তার যেন দেশের জন্য কিছু করার একটি বোধ গড়ে ওঠে ।

ড. মইনুল ইসলাম
অধ্যাপক, অর্থনীতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সুধীবৃন্দ, এই বইয়ের আলোচনা শুরুর আগে দুটি কথা বলতে চাই। এই বইটি মোঃ আনিসুর রহমানের আত্মজীবনী হলেও এবইয়ে জাতির যে ইতিহাস তিনি ধারণ করেছেন ও যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন সেদিকটিই যেন বেশি গুরুত্ব পায়। আমি শামসুল হুদার মাধ্যমে মোঃ আনিসুর রহমানের এই ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তাই প্রারম্ভেই এবিষয়ে আলোচকদের এদিকে দৃষ্টি আর্কষণ করছি। এ অনুষ্ঠানে আমি ঘটনাচক্রে পৌরোহিত্য করলেও আলোচকদের তালিকায় আমিও ছিলাম। আলোচকের দাবী আমি ছাড়ছি না। সেকারণে মোঃ আনিসুর রহমান বক্তব্য রাখার আগেই আমি বক্তব্য রাখবো। যদিও এতে একটু প্রথা ভঙ্গ হবে। কারণ আমিও চাইছি এই বিতর্কে অংশ নিতে এবং আমার মতামত ও জিজ্ঞাস্যগুলি তুলে ধরতে যাতে আজকের অনুষ্ঠানেই আনিসুর রহমান তার বক্তব্যের সময় এর উওর দিতে পারেন। এটুকু বলেই আমি এবার উপস্থাপক কাজী মদিনার কাছে ফিরে যাচ্ছি।

কাজী মদিনা
অনুষ্ঠান উপস্থাপক

চারদিকে স্বাধীনতার উত্তেজনা মানুষের চোখেমুখে এক অসাধারন দীপ্তি। বিজয়গর্বে উন্নত বক্ষে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কারো কারো হাতে এখনো বন্দুক। সাত কোটি সন্তান আজ আর বাংগালী নেই, মানুষ হয়েছে -- এভাবেই গ্রন্থকার মোঃ আনিসুর রহমান তার গ্রন্থটি শুরু করেছেন। প্রথমেই আমরা শুনবো চলচ্চিত্র নির্মাতা এহসানুল হাফিজ জয়ের আলোচনা।

এহসানুল হাফিজ জয়
চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তরুন প্রজন্মের একজন

আমার জন্ম ১৯৭১ সালে। আমার মত যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা গুলি কিভাবে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হবে, কোন দেশে আমরা বড় হবো বা কোন দেশটাকে আমরা পাচ্ছি – সে জায়গা থেকে আমরা বিষয়টিকে কি ভাবে দেখবো? কারণ মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কয়েকটি বছরের তথ্য একটি দেশকে গড়েছে।

কারণ স্বাধীনতা হচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এর পরবর্তী সময়ে একটি সরকার দেশের ক্ষমতায় যাচ্ছে। তারা যে দেশের স্বপ্নের কথাগুলি বলে যুদ্ধে মানুষকে নামালেন, আমরা সেই দেশ পেয়েছি কি? এর উওর যখন আমরা জানতে চাই তখনই কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা – তা বুঝতে পারি না দুটো কারণে প্রথমতঃ আমরা ঘটনাটি দেখিনি। যারা ঐ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা সবাই একই কথা বলছেন না। অনেকে অনেক রকম কথা বলছেন।

আর এখানে একটি বড় প্রশ্ন এসে যায়। এই বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছে ঘটনাগুলি উঠে এসেছে এবং সেগুলির সত্যমিথ্যা যাচাই করা যাচ্ছে। আমি এই বইটি আমার প্রজন্মের আরো ৮ জনকে পড়তে দিয়েছিলাম। তারাও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন । বইয়ে তথ্য উপাত্তগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত যে, তার সত্য মিথ্যা যাচাই করাতে চাইলে সাহসটা অন্ততঃ পাওয়া যায়। আমার কাছে এটিই এই বইটির সবচেয়ে বড় দিক বলে মনে হয়েছে। কারণ আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি তাদের কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথাগুলি যারা বলছেন তারা কতটুকু সত্য মিথ্যা বলছেন তা যাচাই করার কোন অধিকার নেই।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এ মুহূর্তে যে সমাজ বাস্তবতায় বাস করছি এই বইয়ে সে সময়ের একটি রুপরেখা পাওয়া যায়। আজকের আমাদের প্রজন্মকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় স্বাধীনতা মানে কি? আমরা উওরে বলি রক্ত, রাজাকার, পাকিস্তানী সৈন্য, আলবদর - এরকম কিছু শব্দ। কিন্তু যে মানুষটি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তার কাছে স্বাধীনতার মানেটা আসলে কি ছিল? রাজাকার, পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো ভেংগে আমরা কেমন দেশ চেয়ে ছিলাম? কারণ আমি শুধু শুধু যুদ্ধ করতে যাইনি । কিংবা কোন কারণ ছাড়াই একটি মানুষ কেন আমি মারবো বা তার গুলির সামনে আমি দাঁড়াবো? যুদ্ধ করার পেছনে আমার মাথায় কিছু আকাংখা, কিছু চেতনা ও কিছু স্বপ্ন ছিল ।

কিছুদিন আগে আমরা একটি গবেষণা ভিত্তিক ছোট্ট সংস্থা গড়ে তুলি যার মাধ্যমে আমরা কিছু অডিও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টেশন-এর কাজ করার চেষ্টা করি। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল মানুষ মুক্তিযুদ্ধে কিভাবে সম্পৃক্ত হলো তা খুঁজে বের করা। দেখা গেল একজন শ্রমিকের গ্রামে হামলা হয়েছে তখন সে কোন কিছু না ভেবেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে দিল। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। ঐ সময় মেয়েদের একটি হল তৈরি হচ্ছিল। যে শ্রমিকেরা এই হল বানানোর কাজে নিয়োজিত ছিল তারা টিনের শেড বানিয়ে রাতে সেখানেই থাকতো। আমি তখন ওখানে ওদের সাথে অনেক রাত কাটিয়েছি। ওদের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বেশির ভাগই সিলেট এলাকার। আমি তাদের কাছে জানতে চাইতাম "কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে এলেন?" কেন আসলেন - সেই প্রশ্নটি করতাম না ; কারণ আমার কাছে মনে হতো কেন আসলেন প্রশ্নটির মধ্যে সত্যটি উঠে আসে না। কিভাবে আসলেন – এই প্রশ্ন করলে তারা গল্পের মত করে বলে যেতো। তাদের কথার মধ্যে থেকে আমরা জানতে পারতাম তারা কেন যুদ্ধে গেল, তাদের মনের ভেতরে কোন চিত্র ছিল, যে নতুন দেশ হবে তার কাছে তাদের প্রত্যাশা কি ছিল?

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি কথা বলি না। বিশেষ করে শিক্ষিতজনের সাথে একদমই বলি না। কারণ মুক্তিযুদ্ধ এখন "আমাদের রুখে দাড়াতে হবে", "স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে" – এধরনের গুনগত কিছু শব্দে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা একটি সংবিধান পেয়েছি। তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা হলো একটি দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সংবিধান পেল। আমি যৌক্তিকভাবে ধরে নিচ্ছি স্বাধীনতার যে চিন্তা ও চেতনা নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল -সংবিধানটি তা ধারণ করবে। এখন যারা সংবিধানটি রচনা করেছিলেন তাদের দৃষ্টিতে সংবিধানটি সত্যিকার অর্থে এবিষয়টি কতটুকু ধারণ করতে পেরেছে? যারা রচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন না কিন্তু ঐসময় নানাভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন তারা কিভাবে বিষয়টিকে দেখেছেন? --- এবিষয়ে যতটুকু সম্ভব ডকুমেন্টেশন করে রাখার তাগিদ থেকে আমরা একটি কাজ শুরু করি। কারণ ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাদের কথা ভেবেছিলাম তাদের বেশির ভাগই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রত্যেকদিনই আমরা কাউকে না কাউকে হারাচ্ছি।

এই কাজ করতে গিয়ে মোঃআনিসুর রহমানের সাথে আমার পরিচয়। বিভিন্ন জনের কাছে গিয়ে আমরা শোনার চেষ্টা করছি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার পেছনে উৎসটা আসলে কি ছিল? তাদের আকাংখাটি আসলে কি ছিল? তারপর আমরা এটিকে বিভিন্ন শ্রেনী বিন্যাস করার চেষ্টা করেছি। যেমন ডাক্তার, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক - প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব যাতে ডকুমেন্টেশনে থাকে সে বিষয়ে চেষ্টা করেছি। আবার নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেকের কাছে আমরা যেতেও পারিনি। এরকম সময় আনিসুর রহমান স্যারের এই লেখায় আমরা ১৯৭২-৭৫ সালে তিনি যখন পরিকল্পনা কমিশনে ছিলেন তার একটি চিত্র পাই। প্রতিটি উদ্যোগের মজার মজার পরিসমাপ্তির কথা বইটিতে স্যার তুলে ধরেছেন। প্রতিটি উদ্যোগের উওর হলো : নীরবতা ও নিস্তব্ধতা। এর নেপথ্যের কারণ জানতে চাইলে আমার কাছে একটি বিষয় বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় যে, যারা যুদ্ধ করলেন তারা কি যুদ্ধ পরবর্তী দেশের চেহারাটা কেমন হবে, আর তাদের কি করতে হবে - সেবিষয়ে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন?

নাম উল্লেখ  না করে একজন আমলার কথা বলি। ধরা যাক তার নাম 'ক' । তার কাছে গিয়ে পরিকল্পনা কমিশন বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেছেন "পরিকল্পনা কমিশন কি কাজ করেছে? ওরা তো কিছু পেপারস তৈরি করেছে।" আমি এতটুকু জানি পরিকল্পনা  কতগুলি পেপারেই তৈরি হয়। সেটা যারা বাস্তবায়ন করবে তাদের হয়তো আয়োজনের বিশালত্ব থাকবে। তাই আমার মনে হয়েছে যারা স্বাধীনতার সময়, বিশেষ করে পরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা স্পষ্ট ছিলেন না। ঐ জায়গায় একজন মানুষের নাম মনে আসে। তিনি তাজউদ্দিন আহমদ। তার ক্ষেত্রে জানতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে তিনি বোধহয় দেখতে পেরেছিলেন যুদ্ধ পরবর্তী দেশটি কেমন হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর তার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে তিনি পার্টি, সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন। কোন ধরনের বাস্তবায়নের জায়গায় তিনি নেই। আরেকটি জিনিস আমার মনে হয়েছে তিনি জনগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এ জায়গায় এসে আমার মধ্যে আরো প্রশ্ন জেগেছে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়টি আমরা রাজনীতিবিদদের মধ্যে চাপিয়ে দিচ্ছি না তো? এ অর্থে আমি 'চাপিয়ে দেওয়া' কথাটি ব্যবহার করছি যে তাদের মধ্যে বিষয়টি জাগিয়ে তোলা যায়নি। নানা ঘটনা প্রবাহে রাজনীতিবিদরা ঐ ইস্যুগুলিকে সামনে তুলে ধরেছিলেন, নিজেরা বিশ্বাস করেননি। তাই আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা বলে যে কথাটি আমরা বলি তা আসলে কতটুকু ছিল? এটি কোন বিচ্ছিন্নতার গল্প কিনা !

অনিসুর রহমান স্যার, আমার একটি জায়গায় আমার মনে হয়েছে ঐ সময় বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু বা সরকারের যারা বাস্তবায়নের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন ছিলেন, এর আগে যারা চিন্তা করছিলেন একটি দেশ কেমন হবে বা  তাজউদ্দিন আহমদ- তাদের কথা কিন্তু তেমনভাবে বইয়ে আসেনি। ফলে যারা সরকার পরিচালনা করছিলেন তাদের "এ্যাক্টলেস" যে অবস্থা বা তারা যে বুঝতে পারছিলেন না যে কি করতে হবে - এই বিষয়টি ভালোভাবে আপনার বইয়ে আসলেও এর বাইরে যারা দেশকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে চিন্তা ভাবনা করছিলেন অন্তত:পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন আহমদের কথা আমি আর একটু জানতে পারবো বলে আশা করেছিলাম। এই জায়গাটায় কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

শেষ করার অগে আরেকটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর যে দোদুল্যমান অবস্থা বিশেষ করে কোনদিকে যাবে দেশ--- তার কারণ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোকপাত করতে পারবো যদি বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদের যে ইন্টারপার্সনাল সম্পর্ক বা চিন্তার যে দ্বন্দ্ব সেবিষয়ে কেউ যদি বড় ধরনের কোন কাজ করেন। কেউ একজন আগামীতে এনিয়ে কাজ করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
আমার আর তেমন কিছু বলার নেই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক

এহসানুল হাফিজ জয় খুব চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। একথা সত্যি যে এই প্রজন্মের অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো মো: আনিসুর রহমানের বই "পথে যা পেয়েছি"্ তাই জয় যদি বইটি নিয়ে আরেকটু আলোচনা করতেন তবে আমরা এ প্রজন্মের কথা আরো একটু জানতে পারতাম। তবুও তাকে অনেক ধন্যবাদ তার বক্তব্য চমৎকারভাবে উপস্থাপনের জন্য।

মো: আনিসুর রহমান তার বইয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ সৌজন্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। শেখ মুজিব বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞানীদের সম্মান ও স্নেহ করতেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এসে লেখক তৃষ্ণার পথ খুঁজেছেন দেশ গঠনের নানা উদ্যোগ নিয়ে। তাই তিনি যেমন শিক্ষা কমিশনের কথা বলেছেন তেমনি প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষিত কে? আবার নানা গঠনমূলক কাজের কথাও উল্লেখ করেছেন।

ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক ,অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান "পথে যা পেয়েছি" দ্বিতীয় পর্বে আসলে পথে যা পেয়েছেন তাই লিখেছেন। বইটি আমায় আকৃষ্ট করেছে কয়েকটি কারণে। বইটি গভীর অনুসন্ধানধর্মী। উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন এমন যে কোন স্তরের মানুষের জন্য বইটিতে অনেক চিন্তার খোরাক আছে।

৩৫-৩৬ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন চেতনার যে বিকাশ হয়েছে সে দিক থেকে দেখলে বইটিতে মৌলিক চিন্তার উদ্রেককারী বহু বিষয় আছে যা আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়নকামী মানুষদের খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি নিজে বইয়ের ১৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেছেন : কাহিনী মূলতঃ আমার "সামাজিক" জীবন ও প্রশ্ন চেতনার বিবর্তন নিয়ে। "সামাজিক" কেন ইনভারটেড কমার মধ্যে আমি জানি না। এটা আমার একটি প্রশ্ন।

আনিসুর রহমান কি যেন খুঁজছেন সেই ১৯৭২ সাল থেকে। মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনে বসে উনি গ্রামে গিয়ে খুঁজছেন। বইয়ের শেষে এক জায়গায় এসে বলছেন "ঝুঝতেই যদি হয় তবে গ্রামে যেতে হবে।" বইয়ের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ব্যর্থ পরিকল্পনাবিদ অধ্যায়ে আমি কি – তা পরিস্কার করে বলেছেন "এযাবৎ আমার বুদ্ধিগত চেতনার বির্বতনে আমি এক ধরনের ইনটুইটিভ সমতাবাদ, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ, আত্ম নির্ভরতা ও আত্মগর্ব এবং দেশের মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ ও বিকাশ এমন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম।" অতএব আমার মনে হয় এমন আদর্শে বিশ্বাসী হলে মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনা যেভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত উনি ঠিক সেভাবেই করেছেন। এই আদর্শে যদি কেউ বিশ্বাসী হন তবে তিনি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করবেন ও নির্মোহ সত্য বলবেন। আমার ধারণা মোঃ আনিসুর রহমান ঠিক তাই করেছেন। আরেকটি বিষয় বইয়ের মধ্যে রয়েছে। আমরা ক্লাসিকাল বই অনেক পড়েছি । আমি দেখেছি ক্লাসিকাল বইয়ে কনটেন্ট-এর চেয়ে ফুটনোট অনেক বেশি থাকে অনেক জায়গায়। এই বইয়েও ফুটনোট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উদাহারণ স্বরুপ আমি ২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি বিদেশী সাহায্য বিষয়ক ফুটনোটের কথা উল্লেখ করতে পারি। ফুটনোটে বলা ছোট্ট কথা "সাহায্য কথাটি টেকনিক্যালি ঠিক নয়। যদিও বহুল ব্যবহৃত। অধিকাংশ বিদেশী সম্পদই আসে ঋণ হিসাবে এবং অত্যন্ত কঠিন শর্তে। " কথাটি বলা হয়েছে ১৯৭২ সালে, যখন বিদেশী সাহায্য নেব কি নেব না এবং কার কাছ থেকে নেব এমন দ্বন্দ্ব ছিল। করবো সমাজতন্ত্র , সাহায্য নেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের কাছ থেকে যারা আমাদের স্বীকৃতি দেয়নি ---বিপদটি কোথায় হতে পারে ? এমন আলোচনা বইয়ের বিভিন্ন স্থানে আছে। এরপর ধরুন বইয়ের ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি জায়গায় কঠিন সত্য বলেছেন গ্রন্থকার। "যিনি সশরীরে মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন না, সশরীরে নেতৃত্ব দিতে পারেননি - তার কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যায়?" বইয়ের শেষে এসে "জাতির জনক" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে ঘুরে ঘুরে এ কথাগুলি কিন্তু এসেছে। এক বক্তা বলেছেন যে তাজউদ্দিন আহমদের কথা আরো বিস্তারিত এলে ভালো হতো। আমি মনে করি যতটুকু দরকার যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু এই বইয়ে আছে। তাজউদ্দিন আহমদের সাথে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনার মিল অমিল অত্যন্ত স্পষ্ট করে এই বইয়ের মধ্যে আছে। বিশেষ করে ডাইয়েরীটি অত্যন্ত মূল্যবান। এটি বইয়ের ভেতর একটি অনুচ্ছেদের সাথে যোগ করে দেওয়া আছে। এতে প্রতিদিনের যে ঘটনাগুলি লেখা আছে তা কিন্তু ঐ সময়কারই লেখা। এ ডাইয়েরীতে বহু ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। যেমন গ্যাস। জাপানী পার্লামেন্টারী ডেলিগেটস এসে বলেছেন " তোমাদের তো প্রচুর গ্যাস, আমাদের কি গ্যাস দেবে? গ্যাসের জন্য আমাদের ভারতের ওপর নির্ভর করতে হয়।" স্যার তখন বলেছিলেন "আমাদের সব প্রয়োজন মেটানোর পর যদি থাকে, তাহলে

দেব।" আজকের ৩৫ বছর পরও যারা চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন তারাও কিন্তু গ্যাস নিয়ে একই কথা বলেন।

সামন্ত সংস্কৃতি নিয়ে স্যারের কথার সাথে আমি সহমত প্রকাশ করছি।

আমরা মনে প্রাণে পুঁজিপতি হতে চাই। বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারক বাহক হতে চাই। কিন্তু ভেতরে যে সামন্তবাদ এমনভাবে আছে সে মহারাজ!...স্যার কিন্তু জাতির পিতাকে সাহস করে মহারাজ বলেছেন কিন্তু সেই সাথে এটাও বলেছেন এই মহারাজ কিন্তু সেই মহারাজ নয়। আমার মনেহয় এটি বোঝার ব্যাপার। স্যার বলেছেন "পথের সন্ধান খোঁজা আর বোঝা - এক কথা নয়।" আপনি পথের সন্ধান খুঁজছেন মানে এই নয় যে আপনি বুঝছেন। এমনও হতে পারে আপনি বুঝছেন। আমার মনে হয় আনিসুর রহমান স্যার শুধু খুঁজেননি, বুঝেছেনও।

বিদেশী সাহায্য নিয়ে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে বলা তাজউদ্দিনের সাথে বঙ্গবন্ধুর বিপরীত অবস্থান। কোন জায়গায় বিপরীত তাও বলা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৫৫ -এ আছে "মার্কিনীদের কাছে ভিক্ষা বাংলাদেশ কে একটি আত্মমর্যাদাহীন জাতিতে পরিণত করবে।"

৫০ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে " দর্শনগত ভাবে সমাজতন্ত্র বিরোধীদের ওপর নির্ভরশীলতা আর যাই হোক সমাজতন্ত্র আনতে পারে না। "

আবার বিশ্ব ব্যাকের কথাও আছে। বিশ্ব ব্যাংক দাতা হিসাবে আমাদের উৎসাহ দিতে সেসময়ই হাজির হয়ে গিয়েছিল। তারা এসে প্রথমেই বলেছে সব দেব, কিন্তু তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। বিষয়টি অনেকটা ঐ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত। একটু জায়গা দাও, ব্যবসা করবো- আর কিছু করবো না। ভারতবর্ষ যে নিয়ে নিবে এবং ১৯০ বছর যে চালিয়ে নেবে তা তো বোঝার উপায় ছিল না। স্যারের লেখায় বিশ্ব ব্যাংকের শর্তের কথা উল্লেখ আছে। তারা বলেছিল পাকিস্তানকে তারা অনেক টাকা লোন দিয়েছিল। লোনটা তোমাদের এখানেও ব্যবহার হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে তোমরা দায়ভারটি বহন কর। ভেবে দেখুন বিশ্ব ব্যাংক কবে এসেছে এবং কি বলে এসেছে। তাই এরা যেসব কথাবার্তা বলে সেগুলি কোন নতুন কথাবার্তা না। আমরা ঐ ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেইনি।

বইয়ের ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠায় আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সমিতির যে প্রস্তাবনার কথা রয়েছে তা আজো যথার্থ বলে আমি মনে করি। প্রথম শব্দ টি বাদ দিয়ে বাকীগুলি আজও উন্নয়নের জন্য মাথায় রাখতে হবে। প্রথমটি ছিল সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র বিষয়ে স্যারের প্রস্তাবনাটি কি ছিল?

- সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান দক্ষ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মী ও ক্যাডার সৃষ্টি করা। আমি এটা বাদ দিয়ে পরের গুলি ধরি।
- সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে দুর্নীতিবাজ ও ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। আমি জানি না সেটা হচ্ছে কিনা। হযতো সিল্টেকটিভ ভাবে হচ্ছে।
- ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সহ কৃচ্ছ্র সাধন, সহ কৃচ্ছ্র সাধনের প্রোগ্রাম গ্রহন। এসবের কিছুই করা হয়নি।
- উৎপাদন সম্পদের মালিকানা কাঠামোর ধাপে ধাপে সংস্কার। অনেক সংস্কার দেখছি কিন্তু এটি কোথাও নেই।
- এর পরেরটি আমি মনে করি আরো মৌলিক, যা কোন সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পর্যায়ক্রমে ভূমি সংস্কার ও যৌথ খামারের প্রকল্প নেওয়া এবং যৌথ খামারের তত্ত্বাবধানের জন্য

দক্ষ, নিষ্ঠাবান কর্মী প্রশিক্ষণ। এএলআরডি , নিজেরা করি, সমতা - - অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই হয়নি।

- শর্তযুক্ত বিদেশী সাহায্য নেবার চাইতে বিদেশী সাহায্য ছাড়াই চলবার জন্য প্রস্তুত থাকা। আমরা কি প্রস্তুত ? আমার মনে হয় না এখানে একজনকেও পাওয়া যাবে যে খুব একটা প্রস্তুত ।
- দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে গঠনমূলক কাজে মোবিলাইজ করা।
  অনেক মোবিলাইজেশন হচ্ছে শুধু এইটি ছাড়া।
- পুঁজিঘন প্রযুক্তির চাইতে শ্রম ঘন প্রযুক্তির সন্ধান ও প্রয়োগ। কায়িক শ্রমের মর্যাদাকে মহিমান্বিত করার জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন।

কোনটিই তো স্যার নেই। সবগুলিই বাস্তবায়িত হতে হবে যদি আমরা সত্যি উন্নয়ন চাই।

স্থানীয় উদ্যোগ বিষয়টি অত্যন্ত সঠিক একটি বিষয়, উন্নয়নের জন্য যা স্যার এখনো করেন।

স্যারের মতে মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশের উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন। তার পরিকল্পনা কি সম্ভব? কঠিন প্রশ্ন কিন্তু। আমরা যে পরিকল্পনা করছি তা দিয়ে উন্নয়ন হবে না - যদি উন্নয়নকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ।

৯০-৯৪ পৃষ্ঠায় উনি আরো বলছেন উন্নয়নের অর্থ মানুষের ভেতরে বিদ্যমান অসীম সৃষ্টি শক্তির মুক্তি । এই মুক্তির পরিকল্পনাই হলো উন্নযন পরিকল্পনা। আমাদের দেশে যারা উন্নয়ন পরিকল্পনা করেন বা আমরা যারা পড়াই তারা কি একবারও বলি এইসব ইনপুট-আউটপুট মডেল নয় বরং মানুষের ভেতরে অসীম সৃষ্টিশীলতা বিকাশের পরিবেশই উন্নয়ন?

লেখক আরো বলছেন পরিকল্পনাবিদদের কাজ আমার মতে হওয়া উচিত মানুষের আত্মা যে দরজায় আঘাত করছে তা কি করে খোলা যায় তার পরিকল্পনা করা। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে সফর করুন , এ করাঘাত শুনতে পাবেন । আমি মনে করি এটি এখনো সত্য।

উন্নয়ন তত্ত্বের একটি গভীর প্রশ্ন স্যার করেছেন : দরিদ্র কে ?

উত্তর আমার জানা নেই , স্যার আপনি যদি পারেন তবে নিজেই এর উত্তর খুঁজে নিবেন।

১৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় আপনি বলছেন : যে মানুষ বা কমিউনিটি কারো কিছু চায় না : নিজের যা আছে তা নিয়ে এগিয়ে যায় বা নাও যদি যায়, তাকে দরিদ্র বলার অধিকার কি অপরের আছে? আমরা বলে বেড়াচ্ছি এরা দরিদ্র। সে দরিদ্র হলেও তার দারিদ্রের সমস্যা কিন্তু তার নয়। অন্যের চোখে দরিদ্র হলে সে সমস্যা তো অন্যের।

তাহলে প্রশ্ন হলো দরিদ্র কে ? আমরা যারা 'দরিদ্রকে' দরিদ্র বলছি তারা নাকি যাদের দরিদ্র বলছি তারা ? আমি মনে করি দারিদ্র্যের ডাইরেক্ট ক্যালরী মেথড, ...মেথড ইত্যাদি আর দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করে না। এখন মানসিকতার দারিদ্র্য,. মননের দারিদ্র্য, মাইন্ড সেট-এর দারিদ্র্য --- এগুলিকে আপনি কোন পভার্টি বলবেন? আমি মনে করি স্যার যেকালের কথা বলছেন সেকালে নেতৃত্বের মানসিকতার দারিদ্র্য ছিল প্রচন্ড দারিদ্র্য। এটি মনে হয় স্বীকার করা উচিত।

বইয়ের ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠায় স্যার বলছেন " দারিদ্র্যের চরমতম অবস্থাতেও মানুষকে তার মানবিক পরিচয়ের সম্মান দিলে তার মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ মানুষটি বের হয়ে আসে।" আমার মনে হয় আমরা অনেকে বুঝতেও পারছি না কি নিয়ে কথা বলছি। অথচ কথা মনেহয় এটিই ঠিক।

বইয়ে বর্ণিত ১৯৭৪- এর  সময়কার দু'একটি ত্রাণ বন্টনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে শেষ করি। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ঘটনা হবে। ত্রাণ দিতে স্যাররা গেছেন সেখানে। ত্রাণের সময় কে ত্রাণ পাবার যোগ্য - এনিয়ে তর্ক বির্তক হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা এক স্কুল শিক্ষকের কথা উল্লেখ করে। তিনি ৩ দিন ধরে অভুক্ত। সেই শিক্ষকের বাড়ি গিয়ে তারা দেখলেন সেই স্কুল শিক্ষক খিদের ব্যাথা সইতে না পেরে বালিশে পেট চেপে ধরে আছেন। বোঝা গেল লজ্জায় তিনি ত্রাণ নিতে আসেননি। তাকে কিছু আটা দেওয়া হলো। তিনি আটা টেবিলের ওপর রেখে আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে বাগান থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে তাদের উপহার দিলেন। ফুল নিয়ে ত্রাণ দাতারা চুপচাপ চলে এলেন ?  কি বলবেন আপনারা ?

বইয়ে আরো একটি ঘটনার কথা  উল্লেখ আছে। একজন অবস্থাপন্ন মানুষ স্যারদের খাওয়ানোর জন্য তাদের পাশে ঘুর ঘুর করছিল। এক পর্যায়ে তিনি স্যারদের বলেছেন "আপনারা খুব অদ্ভুত মানুষ। কামনা করি আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক।"  স্যার তখন বলছেন "এরকম মানুষের মনের গভীরেও যে মানবিকতা লুকিয়ে থাকে তার খোঁজ তো  আমরা রাখি না।"  তার মানে আমরা যাদের শ্রেণী শত্রু বলে বাতিল ঘোষণা করতে পারি, সব সময় যে তারা শ্রেণী শত্রুর অবস্থান নেয় তা কিন্তু নয়।

আরেকটি ঘটনা আমার কাছে খুব জটিল ও কঠিন বিষয় বলে মনে হয়েছে। স্যারদের হাতে একটি শাড়ি ও কয়েকটি টাকা আছে। একটি পরিবারকে দিতে পারবেন । তারা জিজ্ঞাসা করছেন মাকে "শাড়ি নেবেন না টাকা নেবেন?" মা বলছেন  "মেয়ের পরনে কাপড় নেই।  শাড়িটি দেন, মাইয়াডা পড়ুক।" বাবা বলছেন "ট্যাকাডা দেন, খাইয়া বাঁচুম।" এখন এই অবস্থায় আপনি একজন পরিকল্পনা বিশারদ, নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আপনি কি করবেন? স্যার অবশ্য মনে হয় দুটোই করেছেন।

স্যারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ অবস্থা বিশ্লেষণ করবেন কি করে? স্যার অবশ্য ১৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় বলছেন " আত্মনির্ভর  উন্নয়নের রাজনৈতিক - অর্থনীতির ওপর আমার জানামতে বিশ্বের সেরা আলোচনা হয়। আলোচনা থেকে এই যুক্তি আসে যে বন্যায় বিধ্বস্ত মানুষের  দুর্দশা  দেখিয়ে দেশের প্রভুরা বিদেশের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে তার খুব অল্পই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের দেয়। বেশিরভাগই নিজেরা আত্মসাৎ করে এবং এই করে তারা একদিকে নিজেদের আরো ধনী করে, আরেক দিকে দু:স্থ মানুষকে তাদের কাছ থেকে রিলিফের প্রত্যাশী করে তাদের ওপর নির্ভরশীল করে বসিয়ে রাখে যাতে তারা তাদের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে না পারে। রিলিফের লোভ তাই একটি ফাঁদ।" স্যারের হিসাবে বিশ্বের আত্ম নির্ভর রাজনৈতিক অর্থনেতিক উন্নয়নের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাস। এখানে স্যারের অতীতের লেখাপড়া সব বাতিল ।

উন্নয়নের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাই দিয়েই শেষ করছি । বইয়ের  ১৪৩ পৃষ্ঠায় স্যার বলছেন "উন্নয়নের সংজ্ঞা আমার কাছে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। উন্নয়ন অর্থ গণ জীবনের গর্বিত আত্মপ্রকাশ। মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই পাঠশালা আমাকে শিক্ষা দেয় যে মানুষের নিজের যা আছে তা নিয়ে সে গর্বের সাথে এগিয়ে যায় অপরের করুণা মিশ্রিত দান প্রত্যাখ্যান করে, তার বিত্ত যত কমই হোক সে দরিদ্র নয়, তার কোন দারিদ্র্যের সমস্যা নেই। এ সমস্যা তার যে তাকে বাইরে থেকে দেখে এবং তার চরিত্রের এই দীপ্তি দেখতে পায় না।"
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক

অত্যন্ত প্রাঞ্জল বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ ড. বারকাতকে। আমরা আশা করবো নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা বইটি পড়বেন ও উপকৃত হবেন।

খুশি কবীর
সমন্বয়কারী, নিজেরা করি
এবং মানবাধিকার সংগঠক

আজকের বইটি নিয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্যে বইটি পড়েছি। লেখকের মুন্সিয়ানার কারণে পড়তে পড়তে আমি আবেগে আপ্লুত হয়েছি। বইটি আমার মনকে এমনভাবে ছুঁয়ে গেছে যে আমাকে বার বার পড়তে হবে। আমি আমার মেয়েকে বইটি কিনে দিয়েছি পড়ার জন্য এবং আজকে আমার ভাগনী এখানে উপস্থিত আছে,তাকেও কিনে দিয়েছি। বইটি পড়ার সময় আমি ১৯৭২-৭৫ সালে ফিরে গিয়েছিলাম। নিজের জীবনের অধ্যায়ের সাথে ও চিন্তার সাথে মিলিয়ে দেখছিলাম তখন চিন্তায় এ বিষয়গুলি ছিল কিনা। যারা ঐসময় ছিল না বা বোঝার বয়স
যাদের ছিল না – বর্তমান সময়ে এ বই পড়ে তাদের উপলব্ধি কি হয় আমি তা জানতে চাই। কারণ আমাদের সাথে এই বইটির আবেগ জড়িয়ে আছে।

বইটি খুব সহজ ও সুখপাঠ্য যার মধ্যে আবার অনেক গভীরতা রয়েছে। ড. বারকাত সেকথা তার বক্তব্যে বলেছেন। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে আমি আনিস ভাইয়ের কণ্ঠস্বরই যেন শুনতে পাচ্ছি। মনে হয়েছে আনিস ভাই আমার সামনে বসেই কথাগুলি বলছেন। সেকারণে বইটি আমার মনকে এত ছুঁয়ে গেছে। এ বইটি লেখা সাহসী কাজ। ১৯৭২- ১৯৭৫ সাল সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আমাদের অনেক ভাবনা চিন্তা করে কথা বলতে হয়। কারণ মেপে ঝেপে কথা না বললে বা সমালোচনা করলে আমার দৃষ্টিতে যারা এদেশ ধ্বংস করার জন্য দায়ী তারা আবার মাথায় চড়ে বসতে পারে - এ শঙ্কা কাজ করে। এ বইয়ে আনিস ভাই খুব স্পষ্ট করে তার জীবন ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। এটি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুই মেরুকরণের কথা ভেবে লেখা নয়। বরং তখনকার অবস্থা কি ছিল, কি ঘটেছিল চেতনা কি ছিল ,স্বপ্ন কি ছিল - -- সেবিষয় গুলি বইটিতে চলে এসেছে। আর সেকারণে আমার মনে হয় বইটি অত্যন্ত সাহসী। সকলের পড়া উচিত। বইটি পড়ে বিশেষ করে নিজেদেরকে সেই প্রশ্ন বার বার করা দরকার "আমাদের স্বপ্নটি আসলে কি ছিল ?" যে প্রশ্নটি পূর্ববর্তী বক্তা জয় ইতোমধ্যে করে গেছেন।

আমি মনে করি যে ১৯৭২- ১৯৭৫ সালে দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় যখন দেশ পুন:নির্মাণের কাজের জন্য আনিস ভাই শিক্ষকতার সাথে যুক্ত, গ্রামের মানুষের সাথে যুক্ত থাকার ধারাবাহিকতায় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অধ্যায়ে কি পাচ্ছেন, কি প্রশ্ন করছেন– সেসব কথা দক্ষতার সাথে বইটিতে তুলে ধরেছেন।
মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি সেটাই আসল শিক্ষা - ওটাই আসল বিদ্যালয়। মানুষ যে সৃষ্টিশীল - সেকথা তিনি বার বার বলেছেন। মানুষের ওপর আস্থার কথা স্পষ্ট করে উঠে এসেছে। বইয়ে রংপুরের স্বনির্ভর গ্রামের কথা বলতে গিয়ে মমতাজউদ্দিনের কথা উঠে আসে যিনি আমাদের কাছে কিংবদন্তীর মত ছিলেন। বন্যার মত কঠিন সময়ে যাতে ভিক্ষা করতে না হয় সে মূল্যবোধ ধরে রেখে রংপুরের মত জায়গায় তিনি লড়াই করে গেছেন। আর সেটাই সত্যিকার স্বনির্ভরতা। এখন যে স্বনির্ভরতা দেখি - সেটা প্রকৃত স্বনির্ভরতা নয় । সেটি এখনো আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়।

একটি এনজিওতে কাজ করতে আমরা গিয়ে দেখেছি ত্রাণের সময় যে জায়গায় একবার ত্রাণ দেওয়া হয়, সেখানে যে মানুষ পরের বার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল সে আর দাঁড়ায় না। সে ত্রাণের ওপরই নির্ভর করে। তৃতীয়বার সে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকে কিছুই করে না। লেখকের এই স্পষ্ট বক্তব্য আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে, বিশেষত: এ সময় যখন দেশ আবার বন্যা কবলিত এবং আমরা যখন ভাবছি বিদেশী সাহায্য এখনো আসছে না কেন? দাতারা দিচ্ছে না কেন?

ছাত্রদের ওপর আস্থা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্ররা আর আগের মত নেই এই ভেবে আমরা অনেক সময় হতাশ হই । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকরাও সেরকম নেই আর। আমরা যদি স্বেচ্ছাসেবায় বিশ্বাস করতাম এখনকার ছাত্ররা করবে না কেন? আমরা যদি দেশ গড়া বা গণতন্ত্র রক্ষার কাজে সেই সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, জীবন দিতে পারি, তাহলে এখন করবে না কেন? এই বিষয়গুলি আলোচ্য বইয়ে স্পষ্ট করে উঠে এসেছে। আমার মতে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সিস্টেমের মধ্যে থেকে আদৌ কিছু করা যায় কিনা - সেবিষয়টির ওপরও আনিস ভাই স্পষ্ট করে আলোকপাত করেছেন। হয়তো অনেক স্বপ্ন নিয়ে কেউ আসছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিস্টেমের কারণে আর পেরে ওঠেন না। এখনো আমরা যতই চেষ্টা করি সিস্টেমে কিছু করতে পারছি কিনা বা আমূল পরিবর্তন না করে এই সিস্টেমে কিছু করা যাবে কিনা -- সে প্রশ্নও আনিস ভাই করেছেন। ড. বারকাত বলে গেছেন আনিস ভাই ১৯৭২-৭৪ সালে যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন তা আজো প্রযোজ্য।

আমার মনে আছে সে সময় বন্যার জন্য বিরাট বিশ্বব্যাংকের এ্যাকশন প্ল্যান করা হয়েছিল সব জায়গায় বাঁধ তৈরি করা হবে। তখন আমরা বার বার মহলানবীশের রিপোর্ট সামনে নিয়ে এসেছি। তখনই বলা হয়েছিল যে বাঁধ করাটা ভুল হবে। আজকে যে বন্যা হচ্ছে তা আসলে ঐ বাঁধের কারণেই। অন্য কোন কারণে নয়। এটিই কঠিন সত্য। আসলে আমরা সত্য কথাটি ধরে রাখতে চাই না আমাদের নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু আমি মনে করি সত্য কথা আমাদের বার বারই মনে করতে হবে।

একটি বিষয় আনিস ভাই বার বার নিয়ে এসেছেন যে, মানুষ সৃষ্টিশীল। আর মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করতে হলে আমাকে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আনিস ভাইয়ের সবচেয়ে বড় পাওনা ছিল যখন একটি অনুষ্ঠানে যাবার পর তার এক ছাত্র তাকে বলেছে " আপনি ঐ জায়গায় ভুল বলেছেন।" কেন সেটা ভুল – তাও বুঝিয়ে বলেছে। এই প্রশ্ন করার মত চরিত্র আমাদের মধ্যে আবার সৃষ্টি করতে হবে। আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করার সুযোগ দেই না। আবার কেউ আমাকে প্রশ্ন করুক -- তাও চাই না। কিন্তু প্রশ্ন করার মত চরিত্র সৃষ্টি হওয়া এখন অনেক জরুরী।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সমালোচনা থাকায় ১৯৭৫ সালে সপরিবারে তাকে হত্যা করায় যে ধরণের প্রতিবাদে ফেটে পড়ার কথা ছিল তা হয়নি। তার মানেই ঐ হত্যাকান্ডকে সমর্থন দেওয়া বা মেনে নেওয়া নয়। যদিও আনিস ভাই ঐ ভাষায় বলেননি। তিনি বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সমালোচনা থাকায় তার বিষয়ে মানুষের মধ্যে যে বিশাল আশা ছিল তা কমে গিয়েছিল বলে তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়েনি। আমি আরো শক্ত ভাষায় বলবো বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর যে ভাবে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল তা না হওয়ার মানে কিন্তু ঐ হত্যাকান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়।

১৯৭৫ সালে যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় আমি সেদিন জামালপুরে ছিলাম। আমি একা একজন নারী একটি ভাড়া বাসায় থাকায় আর্মি এসেছিল। এ বাড়ির মালিকসহ পুরো শহর অত্যন্ত ভীত ছিল। সবাই '৭১- এর পাকিস্তানী আর্মিদের কথা মনে করছিল। পাক আর্মিরা বাইরে থেকে এসেছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করা নিজের আর্মিদের যে ব্যবহার আমি দেখেছি তা হানাদার আর্মির থেকে ভিন্ন ছিল না।

ঢাকা শহরে থাকলে হয়তো আমি বিষয়টি অনুধাবন করতে পারতাম না। জামালপুরে এদিন আমি একা আর্মিদের ঘরে ঢুকতে বাধা দিয়েছি। পরের দিন ধীরে ধীরে আমার বাড়িওয়ালী আমার কাছে এসেছে। এসেছেন আরো পাড়া প্রতিবেশী। তারা বলেছেন "কাল রাতে তোমাকে আমরা আশ্রয় দিতে পারিনি। কিন্তু তুমি তো খুব শক্ত ভূমিকা নিয়েছিলে। কি হয়েছিল? তুমি ঠিকঠাক আছো তো?" এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চাইছি যে, আমাদের মনে রাখতে হবে সাড়ে নয়মাস পাক আর্মিদের ভুমিকা কি ছিল

তা মনে করিয়ে দিয়েছিল ১৫ আগষ্টে আমাদের আর্মির লোকদের ভূমিকা। সেকারণে ঐঅবস্থায় মানুষের পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব নাও হতে পারে। আর তাছাড়া নেতৃত্বের সংকট তো ছিলই।

বইয়ের মধ্যে অনেক হিউমার আছে যা আমার ভালো লেগেছে। বঙ্গবন্ধুকে দেবতা নয়, এমন কি দেবতাতুল্যও নয়, একজন ভালো-মন্দে, মেশা রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দেরিতে হলেও হুদা ভাইয়ের উদ্যোগে এ আলোচনা সভার আয়োজন অনেক সময়পোযোগী। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হয়তো তিনবছর আগে এই বিষয়টি এত অনুভব করতাম না এখন এই পর্যায়ে যেভাবে করছি।
আপনাদের ধন্যবাদ।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক

৫ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নাম দিয়েছেন "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার"। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে মহা সংকট, ডিপার্টমেন্টের আইডিওলজিকাল সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বিবরণ দিয়েছেন তেমনি বহু ইতিবাচক বিষয়েরও অবতারণা করেছেন।

ড. আহমেদ কামাল
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিস স্যারের সাথে আমার পরিচয় ১৯৭৪ সাল থেকে ১২ আগষ্ট ২০০৭ পর্যন্ত। মাঝখানে স্যারের বিদেশে অবস্থান, কখনো আমার নিজের বিদেশে অবস্থানের কারণে কিছু বিচ্ছেদ ঘটেছে। আবার দেশে ফিরলে সে বিচ্ছেদ শেষ হয়। দীর্ঘ পরিচয়ে স্যারের কাছে আমি একটি বিষয় শিখেছি এবং আরেকটি শিখতে পারিনি। সেটি হলো যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে লিখিত আকারে করা ভালো যা তিনি করে থাকেন। যা শিখতে পারিনি সেটা হলো স্যার জীবনের সামান্যতম বিষয়েও খুব সিরিয়াস। এখানে আমার শিক্ষা অপূর্ণ। মোঃ আনিসুর রহমানের 'পথে যা পেয়েছি' বইটির আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাকে কেন ডাকা হলো তার একটি ভুমিকা দেওয়া দরকার। আমি বোধহয় ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের একমাত্র শিক্ষক যে শিক্ষক হয়েও মোঃ আনিসুর রহমানের ছাত্র ছিলাম। ১৯৭৪ সালে তিনি সমাজতন্ত্রের যে কোর্স নিচ্ছিলেন সে কোর্সে আমি শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের সারিতে বসে অংশ নিয়েছিলাম। শুধু ছাত্রদের সাথে আমার পার্থক্য ছিল এটুকু যে আমাকে পরীক্ষা দিতে হয়নি। পরীক্ষা দিতে হলে আমি ছাত্রদের চেয়েও খারাপ রেজাল্ট করতাম। হয়তো সেজন্য আমাকে পরীক্ষা দেওয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা দেবার দরকারও ছিল না।

আমি আমার কিছু বক্তব্য আনিসুর রহমান স্যারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক লিখে এনেছি। এর মাঝে মাঝে কিছু কথাও বলবো।

ছাত্র জীবনে আমি অধ্যাপক আনিসুর রহমানের সাক্ষাৎ পাই নি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে উনি চলে যান। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবন শুরু হবার পর উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। দেখা হয় সমাজতন্ত্রের ক্লাসে। তারপর শিক্ষক রাজনীতি, সিন্ডিকেট নির্বাচন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে কিছু অনাচার দেখে উনি খুব ক্ষুব্ধ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি হবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অর্ডারে চলবে তা চালু হয় এবং শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনের সকল স্তরে। সিন্ডিকেট ছিল সবচেয়ে বড় স্তর। সেখানে ৬ জন শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব করার কথা। সেই নির্বাচনে সবচেয়ে তরুণ শিক্ষক হিসাবে আমি আনিস স্যারের সহযোগী ছিলাম। কারণ লেকচারার- এর মধ্যে থেকেও একজন নির্বাচিত হবার কথা ছিল। স্যার যে সব কাজে খুব সিরিয়াস তার প্রমাণ স্বরুপ একটি গল্প বলি। আমরা তখন নির্বাচনে ক্যাম্পেইন করছি, শিক্ষকদের কাছে ভোট চাইছি। তৎকালীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান ছিল। তাই শিক্ষকদের কাছে যেতে হচ্ছে এবং গিয়ে বোঝাতে হচ্ছে কেন দাঁড়াচ্ছি। আমরা এক সাথেই ক্যাম্পেইন করতাম। নির্বাচনের আগের রাতে ঠিক রাত দশটার দিকে স্যার আমার বাড়ি এলেন। এসে ভোটার তালিকার কাগজ বের করলেন। বের করে একটি নাম খুঁজতে লাগলেন। আমি ভাবছি কোন একজন শিক্ষকের নাম খুঁজছেন যার কাছে তার যাওয়া হয়নি। এই ফাঁকে বলে রাখি এই প্রচারাভিযানের সময়ই কিন্তু আমি তার ভক্ত হই। এটিকে যে সিরিয়াসলি নিতে হয় তা আমি তাকে দেখেই শিখেছিলাম। অনেক খুঁজে একটি নামের পাশে তিনি লাল পেন্সিল দিয়ে টিক দিলেন। আমি বললাম : স্যার কার নাম এত খুঁজলেন আর কার নামের পাশেইবা টিক দিলেন? উনি উত্তরে বললেন: আপনার নামের পাশে। একমাত্র আপনার কাছে আমার ভোট চাওয়া হয়নি। আমরা এক প্যানেল থেকে নির্বাচন করছিলাম। তারপরও আমার কাছ থেকেও ভোট চাওয়ার কথা তার মনে হয়েছে। আমি বিস্মিত ও হতবাক। এও কি সম্ভব! এই ধরনের সিরিয়াসলি কাজ করাটাই তার শিক্ষা। আমার দুর্ভাগ্য আমি এ শিক্ষা নিতে পারিনি। আমার মত অনেকেই হয়তো পারেননি।

আনিসুর রহমানের পথ চলায় আমাদের মত অজানা অখ্যাত পথিকরা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এজন্য স্যারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আজকের আলোচনার আয়োজকেরা বইটির দ্বিতীয় খন্ড অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনেতিক প্রেক্ষাপট, ঐ সময়ের নানা সম্ভাবনা, আশা ও হতাশার কথা আলোচনা করার জন্য বলেছেন। কিন্তু প্রথম খন্ডের আলোচনা ছাড়া দ্বিতীয় খন্ডের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। প্রথম খন্ড হচ্ছে আনিসুর রহমানের আনিসুর রহমান হয়ে ওঠার ইতিহাস। সে ইতিহাস না জানলে দ্বিতীয় খন্ড বোঝা যায় না। আয়োজকদের নিষেধ থাকার কারণে আমি সেদিকে যাচ্ছি না। তবে পাঠকের উদ্দেশে বলি প্রথম খন্ডের মধ্যে যে কাহিনীটি রয়েছে সেটা হচ্ছে এক মধ্যবিত্তের আর দশজনের মত না হয়ে ওঠা। দ্বিতীয় খন্ডটি হচ্ছে বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্র না হয়ে ওঠার কাহিনী। আর এই হচ্ছে তার দ্বিতীয় খন্ডের বক্তব্য যা নিয়ে আজকের আলোচনা।

পথ রূপকটি আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। আমি ইতিহাসের ছাত্র। পথ শব্দটির সাথে সাথে আমার চোখে ভেসে ওঠে গান্ধীর সেই লবণ সত্যাগ্রহের কথা। লাঠি হাতে একা এগিয়ে যাচ্ছেন সত্যাগ্রহের জন্য, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য, পেছনে হাজার হাজার ভারতীয় কৃষক দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আনিসুর রহমানকে দেখি পথে একা হাঁটছেন। পেছনে কেউ নেই। নির্ভীক ও নি:সঙ্গ শেরপা যার কোন সাথী নেই। আমরা স্যারের সাথে মিশি, আইডিয়া শেয়ার করি, স্যার যে পথে চলছেন সেপথে কিন্তু আমরা আসলে কেউ নেই। আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের অনেকে কথাটার ইংগিত দিয়েছেন।

এ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা একটু দু:সাধ্য। অধ্যাপক আনিসুর রহমান স্মৃতি কথা লিখেছেন,তাতে তিনি নিজেও উপস্থিত আছেন। দুইটি কারণে লোকে আত্মকথা লেখে। প্রথমত: আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে ভালো লাগে আত্ম প্রচারের মোহ থেকে। দ্বিতীয়ত:, সমাজের কাছে জবাবদিহিতার তাগিদ থেকে। আমি নিশ্চিত আনিসুর রহমান সমাজের কাছে জবাবদিহিতার তাগিদ থেকে আত্মকথাটি লিখেছেন।

আমি ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বলছি আমার কাছে বইটি ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। জাতি রাষ্ট্রের শৈশবের আর জাতির পিতা ও রাষ্ট্র নায়কের এক অজানা কাহিনী। স্যার শিশু রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতা ও এই ভূখন্ডের মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ও সৃষ্টিশীল উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার চিন্তায় মগ্ন। শুধু

চিন্তায় নয়, কর্মসূচী প্রনয়ণেও মগ্ন। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সীমিত সম্পদ নিয়ে উন্নয়নের কথা ভাবছেন। কৃচ্ছ্রতা সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন ও অনুশীলন করছেন। জাতির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে ছুটে যাচ্ছেন। সেকাহিনী আমরা শুনেছি আরো হয়তো জানবো পরবর্তী বক্তাদের আলোচনা থেকে। রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলন – মমতাজ উদ্দীনের সেই চেষ্টার কথা স্যার 'যে আগুন জ্বলেছিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেই গ্রন্থ নিয়ে আগে একবার আলোচনা হয়েছিল। আমি সেখানে এই নামকরণ নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। আজও করছি। 'যে আগুন জ্বলেছিল' নামটির সাথে আমি একমত নই। আমি চেয়েছিলাম বইটির নাম হোক 'যে আগুন নিভেনি'। কারণ যে আগুন নিভেনি তার পেছনেই স্যার ছুটছেন। এই বইয়ের টাইটেলটি রিভাইজ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার জন্য স্যারকে অনুরোধ করবো।

আরো অনেক সৃষ্টিশীলতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন তিনি। কাছ থেকে দেখেছেন, একাত্ম হয়েছেন। নানা ধরণের দুর্যোগে আবার বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক নানা কারণে তাঁকে দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছে। তখন তিনি এসব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। যখন তিনি বিদেশ থেকে ফিরে আসতেন তখন স্নেহবশতঃ আমাকে দেখতে আসতেন। কি চিন্তা করছেন, কি ধরনের উন্নয়নের খোঁজ করছেন, পৃথিবীর কোন কোণে কি হচ্ছে তা সবিস্তারে বর্ণণা করতেন। তেমনি একটি আন্দোলনের কাহিনী "মহারাষ্ট্রের ভূমি সেনা" যা আমি তার মুখে প্রথম শুনি। যতদিন এই আন্দোলন বিরাজমান ছিল ততদিন এর গতি-প্রকৃতি, এ আন্দোলনের বিশ্লেষণ এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে এর বিশ্লেষণ করে - সেই পদ্ধতি নিয়ে যখনই তিনি দেশে ফিরতেন আমার সাথে আলোচনা করতেন। তখন থেকে উন্নয়নের প্রতি আমার আগ্রহ তীব্রতর হয়। এজন্য আমি আজও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি আমায় প্রথম শিখিয়েছেন উন্নয়ন যার জন্য উন্নয়ন সে নিজেই করবে। উন্নয়ন কর্মীর কাজ হচ্ছে উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করা। তারা মানুষকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করবে। বাকীটুকু যার জন্য উন্নয়ন সে নিজেই করবে। আমার মনে হয় এ কনসেপ্ট নিয়ে উন্নয়নকর্মী মহলে আরো আলোচনা হওয়া উচিত।
এই গ্রন্থের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রাষ্ট্র নায়ক শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনা। স্যার উল্লেখ করেছেন এবং তাজউদ্দিন আহমদের সাথে একমত হয়েছেন যে বঙ্গবন্ধুর অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় ও মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত না থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরতে পারেননি। তিনি সারা জীবন তার গুরু হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দীর মতো পাশ্চাত্য বলয়ের প্রভাবে রাজনীতির পথ তৈরি করেছিলেন। আমার কাছে তার ব্যর্থতার পেছনে এটি অন্যতম একটি কারণ বলে মনে হয়। আর তার ব্যর্থতার পেছনে দ্বিতীয় কারণ বলে আমার যেটা মনে হয়েছে তা স্যারের বইয়ে স্পষ্ট করে উঠে আসেনি। প্রভু শুধু দাস তৈরি করে না , দাসও প্রভু তৈরি করে। শেখ মুজিবের শেখ মুজিব হয়ে ওঠার পেছনে সেই সময়ের আমাদের অনেকের দায়িত্ব আছে। আমরা যদি চাটুকারিতা না করতাম, আমরা যদি নির্ভীকভাবে তার সমালোচনা করতে পারতাম, আমরা যদি কয়েক হাজার আনিসুর রহমান তৈরি করতে পারতাম, যারা তার প্ল্যানিং কমিশন থেকে বের হয়ে এসেছিল --- তাহলে হয়তো শেখ মুজিবকে ইতিহাসের এই চরম মূল্য দিতে হতো না। আমার মনে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তার একদলীয় বাকশালে যোগদানের হুকুম আসে তখন আনিসুর রহমান দেশের বাইরে ছিলেন। তার নির্বাচনের ৬ জন সাথীর মধ্যে তিন জন ছাড়া বাকী সবাই বাকশালে যোগ দেন। সেদিন আমার অন্ততঃ মনে হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার আর কোন মানে হয় না। তাকে আমরা এই মেসেজ দিতে পারিনি যে এইভাবে চললে দেশ কিংবা আপনি - কেউ এগুবেন না। ঐ দিন আমরা অতি উৎসাহে তাকে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের সদস্যপদ লাভের আবেদন পত্র দাখিলের জন্য। ইতিহাস সেদিনটি দেখে যেতে পারেনি। কারণ ঐদিনই তিনি সপরিবারে নিহত হন। দেশে স্বৈরাচার নিজে নিজেকে তৈরি করে না। এটি তৈরি হয় দেশের

নাগরিক, জনগণের সম্মতিতে। এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারলে আমাদের রাজনৈতিক আকাশ থেকে দুর্ভাগ্য অপসারিত হবে না।

শেখ মুজিবের আরেকটি সমস্যা ছিল। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন। তার পরিবারের অর্ধেক অবরুদ্ধ ছিল ঢাকায়, অর্ধেক ভারতে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ফিরে আসার পর ছয় কোটি মানুষকে খুব হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যারা সেদিন দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তাদের সকলকে কোলাবোরেটর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ছয় কোটি মানুষের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান তিনি জীবিত কালে করতে পারেননি। এটি তার জন্য ছিল সবচেয়ে বড় সংকটের জায়গা।

যদি আমরা বইটি মন দিয়ে পড়ি তবে আমরা দেখবো অর্থনীতি বিভাগের নেতৃত্ব দিতে আমার স্যার ব্যর্থ হয়েছেন। এই বই পড়ে মনে হয় আনিসুর রহমান রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মত পরশ পাথর ছুড়ে ফেলে পরশপাথর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জনগণের শক্তি দেখেও তিনি সেই শক্তির পাশে দাঁড়াতে পারেননি। এখনো সেই শক্তি তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন । তার সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান এই গ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
আলোচক হিসাবে আমার সমস্যা হচ্ছে আনিসুর রহমানের কোন সমালোচনা করা যাচ্ছে না। তার আত্ম সমালোচনা সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশের বাংলাদেশ না হয়ে উঠতে পারার ইতিহাস করুণ। ১৯৭২- এ এক সাঁওতাল পাড়ায় গান শোনার সুযোগ হয়েছিল আমার। তারা গান গাইছিল তাদের ভাষায়, বাংলায় যার মানে দাঁড়ায় "ঘাট হইলো, বাংলা হইলো না ..."। এই বাংলার অর্থ সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ উপলব্ধি করতে পারি এই বাংলার অর্থ মানুষের মুক্তি, সাঁওতালদের আত্ম সম্মানবোধ ও নিরাপদ জীবন।

নেতৃত্ব আজ দুর্নীতিপরায়ণ। দেশ ও জাতি আজ বিদেশী সাহায্য ও নীতি নির্ভর। বিদেশী দূতাবাসগুলি আজ দেশ চালাচ্ছে। এই মুহূর্তে দেশ বন্যা কবলিত। বিদেশী সাহায্য নেই বলে কেউ বানভাসি মানুষের পাশে নেই। নাগরিক শক্তি আজ টকশোতে আশ্রয় নিয়েছে। এরকম সময়ে আনিসুর রহমানের 'পথে যা পেয়েছি' গ্রন্থের আলোচনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ আলোচনা আরো গুরুত্বের সাথে হওয়া উচিত।

শেষ জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দু:খে হতাশায় সাঁওতাল পল্লীতে স্থান করে নিয়েছিলেন। ভদ্র সমাজ ছেড়ে জীবনের বাকী দিনগুলি তাদের সাথে কাটিয়ে গেছেন। আনিসুর রহমান রবীন্দ্রনাথের গানের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

তবুও কিন্তু এখনো সময় আসেনি জিজ্ঞাসা করার : পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদকে লেখক শেষ অধ্যায় বলেছেন। এখানে বঙ্গবন্ধু হত্যার কথা বলেছেন তেমনি সংগীতকে একটি বড় শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ড. হামিদা হোসেন
গবেষক, নারী অধিকার ও মানবাধিকার কর্মী

আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমাকে যখন হুদাভাই আমন্ত্রণ জানালেন এই বইয়ের ওপর কিছু বলার জন্য তখন আমি ভাবছিলাম আমাকে কেন ডাকা হচ্ছে? আমি কতটুকু বাংলা

পড়তে পারি সেটি দেখার জন্য কি ? আমার মনে হয় আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি। বইটি আমি পড়েছি। যদিও সময়ের অভাবে পুরো শেষ করতে পারিনি । আরো একটি কারণে হয়তো আমাকে ডাকা হয়েছে। আমি আর আনিস প্রায় সমবয়সী। আনিস আর ডোরা কে আমি চিনি ১৯৭২ সাল থেকে। সে সময় দরজার আড়ালে থেকে তাদের প্ল্যানিং কমিশনের যে সমস্যা ছিল তার কথা শুনেছি। আমারও কিছু স্মৃতি থাকতে পারে আপনাদের বলার মতো। এই বইটি আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের একটি অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আনিস দেশের বাইরে ছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে শুধু সরকারের কাছের লোক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষের কাছের লোক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। যে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের সময় সেদেশের মানুষের মধ্যে যে মোবিলাইজেশন, কমিন্টিমেন্ট ও ঐক্য দেখা যায় স্বাধীন হবার পর তার মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। সেটা আনিস প্রত্যক্ষভাবে না হলেও খুব ভালো করে তার এই বইয়ে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধুর যে ক্যারিশমা ছিল তার দ্বারা তিনি ইমোশনালি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাজউদ্দীন ভাই ও তার ইনটেলেকচুয়াল টিমের সাথে তার খুব মিল ছিল বলে আমার মনে হয়। আমরা দেখেছি আনিস যখন প্ল্যানিং কমিশনে ছিলেন তখন এক সময় তাজউদ্দীন ভাই সরকার থেকে সরে গেলেন বা তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আনিস হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার এসব শব্দগুলি ১৯৬৯ থেকে শোনা যাচ্ছিল। ৭১-৭২ তেও এসব কথা অনেক শোনা যেত। কিন্তু আনিসের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে ৭২ এর পরবর্তী সময়ে এ কথাগুলি শুধু বলার জন্য ব্যবহৃত হতো । আমরা দেখলাম এই সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বপ্ন একদিকে রয়ে গেল আর দেশ চলে গেল ক্ষমতা চর্চার পথে। এই সমাজতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বপ্ন বাস্ত বায়নের ইচ্ছে নেতৃত্বের কতটুকু ছিল সে প্রশ্ন আনিসের বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও আনিস প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন জোহারা তাজউদ্দিন, এয়ার ভাইস মার্শাল একে খোন্দকার। এরাসহ যারা ঐ সময় এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা সবাই যদি ঐ সময়কার অভিজ্ঞতার কথা লেখেন তবে সবার লেখা থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসবে তা একত্রিত করলে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের চিত্র পাবো বলে আমি মনে করি। প্ল্যানিং কমিশন আর ব্যুরোক্রেসির মধ্যেকার নানা টেনশনের কথা আছে আনিসের বইয়ে। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের নাম কেন উল্লেখ করেননি আনিস তা বোঝা গেল না। তবে এটুকু জানলাম আমরা যে একজন সদস্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ত্রিকোণমিতি কষতেই ব্যস্ত থাকতেন, আরেকজন সমাজতন্ত্রের খোঁজে সেই রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া চলে যেতেন। আর আনিস অন্যপথ খুজঁতে গ্রামে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে কোন মিটিং পয়েন্ট আমি দেখিনি। আনিস লিখছেন "চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখলাম কিন্তু উত্তর পাইনি" বা "প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম, উওর পেলাম না"। আমার মনে হয়েছে আনিসের মধ্যে একটি ইনোসেন্ট ভাব আছে। আনিস জানেন উওর পাবেন না, তবুও লিখছেন। এর মধ্যে দিয়ে আনিস প্রশ্ন তুলতে চাচ্ছেন, যে কথা তারা মুখে বলেন তা আসলেই মনে বিশ্বাস করেন কিনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর গ্রামে গ্রামে গেছেন ছাত্রদের নিয়ে। তখন তিনি অবস্থান করেছেন ছাত্রদের সাথেই। এতে করে ছাত্রদের সাথে তার সলিডারিটি গড়ে উঠেছিল। ছাত্ররা তার সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এক সময় আনিস ১৯৭৪ সালে আসম আবদুর রবের আমন্ত্রণে জাসদের প্রথম মিটিংয়ে প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এই জায়গায় এসে আমি আনিসকে প্রশ্ন করবো তিনি যদি জানতেন রবের সমাজতন্ত্র সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের পথ থেকে কতদূরে অবস্থান করছে তবে তিনি যেতেন কিনা। এটি হয়তো তার পরের কোন বইতে পাবো।

একবার আমি ও আনিস একসাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে রিলিফ দিতে গিয়েছিলাম। আনিস, আপনার মনে আছে কিনা জানি না । রিলিফ দিতে গিয়ে আনিসের অভিজ্ঞতায় আমরা ঐ শিক্ষকের কাহিনী জানতে

পারি। আর আমার অভিজ্ঞতায় আমি এক জমিদারকে পাই যিনি বলেছিলেন আপনাদের আনা এ চাল কি করে খেতে হয় এরা জানে না, এগুলি আমাকে দিয়ে দিন। আমি কিনে নেব। আমি তখন আনিসকে জানিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এই লোকের সাথে আমরা একসাথে রিলিফের কাজ করতে পারবো না।

আজ এই বই নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। আমার এই বইটি ভালো লেগেছে কারণ এটি একটি ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরেছে। স্বাধীনতার পর নানা স্বার্থন্বেষী মহলের আর্বিভাব দেখা গেছে। আন্দোলনে হয়তো এরা অংশ নিয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেছে এ অংশগ্রহণের পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা লুক্কায়িত ছিল। আমি আনিসকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে 'রীব (RIB) বাংলাদেশ'- এ একসাথে কাজের সুবাদে আমি জানি আনিস এখনো গণ গবেষণার মাধ্যমে মানুষের কথা শুনতে চাইছেন। শুধু তাই নয় নিজেরও কিছু কথাও এর সাথে যোগ করতে চাইছেন। ধন্যবাদ ।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক
ধন্যবাদ ড. হামিদা হোসেন আসলেই আপনি বইটি পড়েছেন ও আমাদের কাছে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। সুধী মন্ডলী, আপনারা জানেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। আলোচক ড. মইনুল হোসেন সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তার ইচ্ছে অনুযায়ী আলোচক হিসাবে তার দাবী মেনে নিয়ে মোঃ আনিসুর রহমানের বক্তব্যের আগে তাকে বইটি নিয়ে আলোচনা করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ড. মইনুল হোসেন
অধ্যাপক, অর্থনীতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও
সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র হিসাবে আমি স্যারের প্রত্যক্ষ ছাত্র। তিনি আমাদের মাইক্রো ইকোনোমিকস কোর্স নিতেন। একই সাথে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন। এখানে আমি গুরুকে সালামী দিতে আসিনি। বইটি পড়তে গিয়ে অনুক্ষণ হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। একটি স্বর্ণযুগ জাতির সামনে এসেছিল। আমরা তা কিভাবে হারালাম, সেটা তার ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারণাতে উঠে এসেছে। তখনকার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তার বক্তব্য কিছুটা মূল্যায়ন করবো। আমি ছাত্র হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছি। আমি প্রথমে আজ ১২ আগষ্ট শ্রদ্ধা জানাবো জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। সমবেদনা জানাবো বানভাসী মানুষকে।

আমার দৃষ্টিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেনানী ও কান্ডারী তাজউদ্দিন আহমদ ও আনিসুর রহমানের মধ্যে একটি মিল আছে। দুজনই অভিমানী। তাজউদ্দিন এত অভিমান করলেন যে বঙ্গবন্ধুর ভুলের পর ভুলের প্রতিবাদ না করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি বার বার কেঁদেছেন, কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জোরালো হয়নি। বঙ্গবন্ধুর একের পর এক ব্যর্থতার যে নজির উঠে এসেছে সেখানে রুখে দাঁড়াননি। আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও জনাব তাজউদ্দিনকে জাতি ও আওয়ামী লীগ প্রাপ্য সম্মান দিতে পারেনি।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। আর তাই বাঙ্গালী জাতি যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালী থেকে মানুষ হয়ে গেছে সেটি বুঝতে পারেননি। এই কথাটি আনিস স্যার বইতে বলার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের অনেক গুলি ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে বঙ্গবন্ধু আনিসুর রহমানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তাই দেশে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যপদে

তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে। তার অনুপস্থিতেতে সেটা গেজেট হয়ে গেছে। তিনি ৫ ফেব্রুয়ারীতে দেশে ফিরে উপাচার্যের কক্ষে তখনকার উপাচার্য ড. মোজাফ্ফর আহমেদ ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে ১ তারিখের ব্যাক ডেটে কাজে যোগ দান করেন। আনিসুর রহমানের আলোচনায় আমলাতন্ত্র বনাম পরিকল্পনা কমিশনের বিরোধের কথা এসেছে। তার একটি তত্ত্ব তার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করবে।পাকিস্তান যেমন একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে নরকীয় হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ঐরকম একটি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানের ইতিহাস যেমন সামরিক ও বেসামরিক ইতিহাস, তেমনি ৩৬ বছরের ইতিহাস আবার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ আবার সেই আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের খোলসে ঢুকেছে, তার থেকে আজও বের হতে পারেনি। এই তাত্ত্বিক আলোচনা যদি সামনে আসতো তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম, বাইরে থেকে আমলাতন্ত্রের দুর্গে ঢুকে এই দু'চার জন মেধাবী অর্থনীতিবিদ, টেকনোক্র্যাট তাদের দুর্গ দখল করবে তা কিন্তু আমলাতন্ত্র সহজে মেনে নেবে না। আমরা তাই দেখতে পাই যে মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিনপন্থী লবিটি স্বাধীনতার পরও সক্রিয় ছিল। এমনকি তার পরিবারের ভেতরেও লবিটি ক্রিয়াশীল ছিল। আনিসুর রহমান পরিবার তন্ত্রের কথা উল্লেখ করলেও নাম উচ্চারণ করেনি। আমি সেই নামগুলি উল্লেখ করবো। দেশে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধু যদি তার ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ আর তাজউদ্দীন সম্পর্কে ব্রীফিং পান তবে তাজউদ্দীনের ভূমিকার মূল্যায়ন করবেন কিভাবে? আলোচ্য বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে ২০/২/৭২ তারিখে গ্রাম কর্মী বাহিনী গঠনের জন্য আনিস স্যার একটি প্রস্তাব তৈরি করে তাজউদ্দীনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন নিজে সেটা নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। কিন্তু এরপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। আনিস স্যার লিখছেন "তাজউদ্দীন যে আর আওয়ামী লীগের কমান্ডে নেই আমি বুঝে গেলাম।" এখানে টানাপোড়েনের কথা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগে বাম প্রগতিশীল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী একটা অংশ ছিল। ষাট দশকের শেষার্ধে ছাত্র লীগের কর্মী হিসাবে যখন আমরা মিছিল করতে যেতাম তখন এই দুই অংশের টানাপোড়েন আমরা দেখেছি। ১৯৬৯ - এর গণ অভ্যুত্থানের সময় আমরা যারা ছয় দফার দাবী থেকে এক দফার দাবী তুলেছিলাম তাদের মিছিলের মধ্যেই মার লাগাতো আমাদের ছাত্র লীগেরই এক অংশের কর্মীরা। ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খান ষাট দশকের পুরোটাই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। তাদের বিরোধ মুক্তিযুদ্ধে কিছুটা কম ছিল। সেজন্য দুজনেই মুজিব বাহিনী গঠন করেছেন। কিন্তু তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে ছিল এই মুজিব বাহিনী। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ঘোষণা করে দিচ্ছেন। জাতীয়করণের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ২৬ মার্চ ঘোষণা হয়ে যাচ্ছে। ঐ সময়ে স্যারের ডাইয়েরী পড়লে দেখবেন এই ঘোষণার জন্য অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। পেছনে সিরাজুল আলম খানসহ যারা তখনো আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যাননি তাদেরও একটি ভূমিকা ছিল হয়তো। কিন্তু পরে দেখুন, মার্কিন লবি সক্রিয় হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে ৪ঠা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং এপ্রিলেই ছাত্রলীগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। রব-সিরাজের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাদ আর শেখ মনির মাথা এবং খন্দকার ইলিয়াসের কলম থেকে মুজিববাদের সৃষ্টি হলো যা চাটুকারিতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনে পরিণত হয়।

এই কাহিনীগুলির একটি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। আমি মনে করি বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাজউদ্দীন ও আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নষ্ট করার পেছনে এই পুঁজিবাদী লবি বনাম সমাজতন্ত্র নিয়ে যে হঠকারিতার যে রাজনীতি আমরা নিজেরা না বুঝে করেছি তার দায় কিন্তু কম নয়।

ভূমি সংস্কারের মূল প্রস্তাব দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি দেখেছি ঐ ভূমি সংস্কারের নীতি যদি তখন গৃহীত হতো তবে পশ্চিম বাংলার অনেক আগেই আমরা সে সুফল ভোগ করতে পারতাম। যে সুযোগটা আমরা হারিয়েছি সেটা কিভাবে শুট ডাউন করা হয়েছিল তা ব্যক্তিগতভাবে আনিস স্যারের

কাছ থেকে শুনেছি। এই সুযোগ নষ্ট হয়েছিল শেখ মনি - তোফায়েলদের অসহযোগিতায়। তিনি (তাজউদ্দিন) কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে প্ল্যানিং কমিশনে বলেছেন আমি পারলাম না।'

১৯৭২ -৭৫ সালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এসেছিল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেটা প্রথমদিকে চার মাস আওয়ামী লীগের রাজনীতির মূল ধারায় ছিল। ভুল যেটা হলো ঐ হঠকারি ধারা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে যায়নি। প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করে তারা জাতিকে একধারায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগকে দু ধারায় বিভক্তি বড় ভুল ছিল। এই ভুলের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে পুঁজিবাদী লবির হাতে সোপর্দ করা হয়েছিল। এর ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা আমাদের জীবদ্দশায় আর পূরণ হবে না। আমার মনে আছে ডাকসু নির্বাচনে জয় লাভের পর গণভবনে গিয়েছি বঙ্গবন্ধুকে সালাম করতে। তিনি তখন বলেছিলেন "কেন তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো, কার কাছে রেখে যাচ্ছো আমাকে?" তার এই প্রশ্নের জবাব জীবনে আমি পাবো না। আমি মনে করি এই ভুল যারা করেছেন তারা জাতির কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই ভুলের ক্ষতিপূরণ আর হবে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্ল্যানিং কমিশনের চারজন সদস্যর মধ্যেও মতভেদ ছিল। তারপরও তারা কমবেশি সমাজতন্ত্রর পথেই হাঁটছিলেন। বইয়ের পৃষ্ঠা ২৫-এর পর আমরা দেখতে পাই আনিস স্যার বঙ্গবন্ধুকে বলছেন: "আপনি সমাজতন্ত্র করবেন বলছেন, কিন্তু সিনিয়র সচিবদের মধ্যে ক'জন বিশ্বাস করে সমাজতন্ত্রে?" বঙ্গবন্ধু বলছেন "আপনি কিছু নাম দিন, দেখি কি করতে পারি?" সিরিয়াস মানুষের মত অনুসন্ধান করে স্যার কিন্তু কিছু নাম দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে। এর কোন হদিস আর পাওয়া যায়নি। জাতির পথ নির্দেশ করার মূল প্রতিষ্ঠান প্ল্যানিং কমিশন নিজেই ১৯৭২ সালের মধ্যেই আওয়ামী লীগের একটি এপেনডিক্সে পরিণত হয়েছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ পরবর্তীতে আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্রের পথে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে শেখ মুজিব সমাজতন্ত্রের শতভাগ নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন না । তবে ষাট দশকের শেষে তার মধ্যে যে মেটামোরফোসিস এনেছিল এবং আওয়ামী লীগের দু:শাসন, লুটপাট তন্ত্র , ক্রমশ: বণিক শ্রেণী সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া ১৯৭২-৭৫ সালে দেখা গেছে - সেই ডায়মেনশনটা আমরা যদি মনে না রাখি আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মনিকে ভাগ্নে নয়, তাত্ত্বিক হিসাবে দেখতেন। তার সব খারাপ ছিল, এমন কিন্তু নয়। যদিও তিনি সমাজতন্ত্র চাননি। আর এই শেখ মনির মাধ্যমেই মুশতাক পৌঁছে গিয়েছিল শেখ মুজিবের কাছে। এই প্রসংগে বইয়ে ব্যাখ্যা করার সুযোগ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢোকার আকুতি এবং ভারতের অবস্থানের বিষয়টি। ভবিষ্যতে স্যারের অন্য কোন লেখায় এই বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করা হবে আশা করি।

প্রফেসর আনিসুর রহমানের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি এবং গত ৩৬ বছরে যেটুকু অর্থনীতি শিখেছি তাতে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের কখনোই একটি বিদেশী পয়সার সাহায্য দরকার ছিল না। রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তার যে মূল্যায়ন তার সাথে খুব একটি দ্বিমত পোষণ করি না। তবে আমার কেন জানি মনে হয়, ১৯৭৪ সালে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পর বঙ্গবন্ধু তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এবং '৭৪ পর '৭৫-এ মৃত্যুর পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোবিলাইজেশনের চেষ্টা হয়েছিল। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রত্যেক জেলায় জেলায় উন্নয়নের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অমন দুর্ভিক্ষের পরও ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলা দেশ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

আমি মনে করি বাকশালের মত মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তি নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা গেলে আমরা সামাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে পারতাম।

১৯৭৫ সালের ১৩ জানুয়ারী পত্রিকায় দেখুন। দেখবেন বঙ্গবন্ধুকে লাইফ প্রেসিডেন্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তখনই আমি বলেছিলাম তাকে হত্যার ব্যবস্থা হচ্ছে। কারণ তাকে সরানোর ঐ একটাই পথ খোলা থাকবে । পরিবারতন্ত্র তখনও ছিল । ছিল দুর্নীতি ও লুটপাট। তবে এগুলি ছিল ব্যতিক্রম, কোন নিয়ম কিন্তু নয়। মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রানপাতের জন্য কিছু মানুষ ছিলেন। আজ সেটা নেই।

অর্থনীতি এখনো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞান হয়ে রয়েছে। এর মুক্তির জন্য আনিস স্যারের আরো সোচ্চার ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। ঘটনাচক্রে দেশ ত্যাগ করায় তা পারেননি। তবে তিনি তার চিন্তা ও জীবন থেকে শিক্ষার প্রক্রিয়া থেকে সরে যাননি। সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করলে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে না। দারিদ্র্যকে অর্থনীতিবিদদের ঝুলিতে রেখে দেওয়া ভুল হবে। তাই বিকল্প চিন্তার দরকার আছে।

আমি ড. আহমেদ কামালের কথার তীব্র প্রতিবাদ করি। আনিসুর রহমান রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। গভীরভাবে পড়লে বুঝবো রবীন্দ্রনাথের লেখায় সমাজ দর্শন, অর্থনীতির দর্শন রয়েছে যা আজো প্রাসঙ্গিক। চলুন আমরাও রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করি, শূধু গান গাইবো না, তার মর্মও বোঝার চেষ্টা করি।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ থেকে আনিসুর রহমান নিজেকে মানুষের অর্থনীতি ও সমাজ চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করাতে পেরেছেন বলে তাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি দীর্ঘায়ু হোন। আজ একা চলছেন – একদিন তার পথে মানুষের উন্নয়নের চিন্তা ধাবিত হবে । আমি তার সাফল্য কামনা করি।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক
ধন্যবাদ ড. মইনুল হোসেনকে সবিস্তারে আলোচনা করার জন্য। আমরা এবার লেখক মোঃ আনিসুর রহমানের অনুভূতি শুনবো।

অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান
অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী

আমি অত্যন্ত বিব্রত । কারণ আমি চাইনি আজকের আলোচনা আমাকে ঘিরে এতটা হোক। যদিও জানি বইটি আমার। পুরো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আমি চেয়েছিলাম ইস্যুগুলি আরো আলোচনা করা দরকার। এ সময় অনেকে মিলে যদি কিছু প্রেসার তৈরি করা যেতো সরকারের ওপর তাহলে এ নৈরাশ্যের মধ্যেও খুব বড় না হলেও ছোটখাটো অগ্রগতির পথে যাওয়া যেতো। যে অগ্রগতি শুধু ব্যালট বক্স - এর বিষয় নয়, আরো গভীর কিছু ।

বিশেষ করে শেখ মুজিবের ব্যর্থতা - যেটার জন্য পুরোপুরি তিনি একা দায়ী নন। ড. মইনুল খুব গভীর একটি কথা বলেছেন - জাসদ যদি বেরিয়ে না যেতো তবে হয়তো অন্য রকম কিছু হতো। এটি সকলের চিন্তা করা দরকার। আমার নিজের মনে হয়েছে আজকের জন্য ইতিহাস থেকে খুব বড় শিক্ষা এই যে আমরা শেখ মুজিবের মত বড় নেতা পেয়েছিলাম, যিনি প্রতিবাদী অন্দোলনের সফল নেতা হলেও ক্ষমতায় গেলে কিভাবে দেশ পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে তার প্রস্তুতি ছিল না।

মইনুল আমলাতন্ত্রের কথা বলেছেন। পাকিস্তানে ছিল, এখানেও আছে। রাজনীতিবিদরা আমলাদের কাছে আত্মসমপর্ণ করছেন। বিদেশে রাজনীতিবিদরা নিজেরাই ইনটেলেকচুয়ালি একটি জায়গায় দাঁড়ান। তারা নিজেরাই ঠিক করেন কোন উপদেষ্টার পরামর্শ নেবেন । আমাদের রাজনীতিবিদদের সে ট্রেনিং হয়নি।

আমাদের ইতিহাসই হলো রাজপথে সংগ্রামের ইতিহাস। গঠনমূলক কাজের কোন সুয়োগ হয়নি। রাজনীতিবিদদেরও নিজেদের ইনটেলেকচুয়ালি দক্ষ হতে হবে। আমার প্রস্তাব :

- রাজনীতিবিদদেরও ট্রেনিং দেওয়া হোক। সিভিল সার্জেন্টদের, সামরিক অফিসারদের যেমন দেয়া হয়।
- পার্টির ম্যানিফেস্টো হবে সিরিয়াস ধরণের । কোন পার্টি যদি ম্যানিফেস্টোতে প্রমিস করে পাওয়ারে আসে এবং ২ বছরের মধ্যে তার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যায় তবে আমরা তা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে যেতে চাই। অর্থাৎ তাকে তার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেবার একটি প্রক্রিয়া থাকা দরকার বলে মনে করি।
- এই ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের টীম কারা? টীমের সেই যোগ্যতা আছে কি? বিদেশে বিরোধী দলের শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকে । ক্ষমতায় গেলে তারা কিভাবে দেশ পরিচালানা করবেন - সেবিষয়ে প্রস্তুতি থাকে। আমাদেরও সেরকম শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকা দরকার।

আমাদের জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলাম যার জন্য কোন প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। একমাত্র তাজউদ্দীনের মধ্যে তা ছিল, এগিয়ে যাবার গভীর চিন্তা করতে তাকেই দেখা গেছে। নিজেকে গঠন করার প্রক্রিয়া অল্প বয়স থেকে তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। তার ডাইয়েরীতে এর প্রমাণ আছে ।

ভূমি সংস্কার করা দরকার ছিল। আমরা আজো রয়ে গেছি সামন্তবাদী সমাজে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পেট্রন- ক্লায়েন্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। একে আঘাত করা না গেলে যে পার্টি ক্ষমতায় আসুক না কেন ঐ পেট্রনই ক্ষমতায় আসবে। আমি আশা করতে চাই এ আলোচনা চলমান থাকবে।

কাজী মদিনা
উপস্থাপক

দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে আমরা আলোচনা শুনলাম। ১৯৭২-৭৫ এর ঘটনা নিয়ে লেখক মোঃ আনিসুর রহমান বইটি লিখেছেন। ঘটনাগুলি কখনো আমাদের উদ্বেলিত করেছে কখনো হতাশ করেছে । কখনো বা আবার আলো দেখিয়েছে। আসুন আমরা সমস্বরে বলি :

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে / একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরীর ভিড়ে/ এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার লোক চক্ষুর আড়ালে/ এখানে জমেছে অন্ধকার .....
এই আহ্বান জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের মৃঙ্গল হোক। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

---